আমাদের গলিতে

দিলরুবা শাহানা

হ্যা, আমাদের গলিতে। ঠিক বলছি আমাদের গলিতেই। ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটেছিল। একই সময়ে মৃত্যু হানা দিল, একজন মানুষও চিরতরে নিরুদ্দেশ হল। কারবালার ময়দানের রোদন আছড়ে পড়লো গলিতে। গলির দু'দিকে পাঁচটি করে বাড়ী। ঢুকলে বা দিকের দুই নম্বর বাড়ীর কিশোর ছেলে সম্ভবতঃ শীতলক্ষ্যা নদীতে নৌকা ডুবে মারা যায়। ঐ গলির ডানদিকের তিন নম্বর বাড়ীর বাবা দেশের বাড়ী রওয়ানা দিয়েছিলেন। দেশেও পৌঁছান নি, ঢাকায়ও আর ফিরেননি। বাবা ও কিশোর ছেলে ঢাকাতে ছিলেন। পরিবার আগেই দেশের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুই নম্বর বাড়ীর মা ছেলেকে রক্ষার জন্যই পালানোর জায়গা না পেয়ে নিজে যেচে বাড়ীওয়ালার শ্বশুরবাড়ী যাবেন বলে নৌকাতে তাদের সঙ্গী হন। ছেলেকে পানিতে ভাসিয়ে মা ফিরে আসেন।

প্রায় জনশূণ্য গলির বা দিকের দুই নম্বর বাড়ী থেকে মনে হত মাটি ফুঁড়ে নীচু সুরে হাহাকার "যাদুরে, সোনারে, বাবারে আমার" ক্ষনে ক্ষনে শোনা যেত। আমাদের সাথে সাথে পৃথিবীর হৃদয়েও তখন রক্ত ঝরাতো সে রোদন।। আর তিন নম্বর বাড়ীর উচ্চ স্বরের আর্তি "ও আববাগো, ও আববাগো" আকাশের প্রাণে বান আনতো। আর আমরা ভয়ে শুকিয়ে যাওয়া গলায় অনবরত আল্লাহ্‌কে ডাকতাম।

আমাদের অসহায় গলির ততোধিক অসহায়া মা যাঁর ঢাকা ছেড়ে পালানোর উপায় ছিলনা। শুধু বলতেন "আল্লাহ্ আল্লাহ্ কর আর দেশের জন্য পানা চাও"। দিশাহারা মা মৃত ছেলেটির জন্য দোয়া করার কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন বোধহয়। পরে বুঝেছি মায়ের কাছে পুত্রহারা নারীর রোদন, উড়িয়ে দেওয়া সেতু, পুড়িয়ে দেওয়া জনপদ, নির্যাতিতা নারী সবাই ছিল অসহায়

দেশের প্রতিচ্ছবি। তখন দেশের জন্য পানা কিভাবে চাইতে হয় বুঝতাম না। শুধু বলতাম "আল্লাহ আর কান্না না, আল্লাহ গো কান্না থামাও"। কান্নার সুরে শুধু দুঃখ নয় কি এক বিভীষিকা যেন জড়িয়ে ধরতো সবাইকে।

এরপর যশোর থেকে আমাদের গলিতে এলেন মূর্তিমতী শোক এক আত্মীয়া। তাকে আগে দেখিনি কখনো। চাচাতো বোনের স্বামীর দূরসম্পর্কের বোন। ইনার স্বামী, কলেজ ছাত্র পুত্র ও মেয়ের জামাই তিনজনই নিখোঁজ মার্চ মাসে।। ওরা জীবিত কি মৃত জানেন না। ওদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল আজও অব্দি জানা যায়নি। সেদিন আত্মীয়াটির সঙ্গে ছিল চারটি সন্তান। তিনজন নিতান্তই ছোট। পরে শুনেছি উনার অল্পবয়সী বড় মেয়েটি যার স্বামী নিখোঁজ। তখন ছিল সে গর্ভবতী। পরদিন কে যেন এসে আমাদের বাসা থেকে উনাদের নিয়ে গেলেন। বহুবছর পর শুনেছি ঐ আত্মীয়াটি পাগল হয়ে শেষে মারা যান। আত্মীয়দের কল্যানে তার সন্তানদের কেউ অবশ্য পথে ভেসে যায়নি।

সেই গলির পুত্রশোকে কাতর মায়ের রোদন আর আমাদের বয়সীই ইস্কুল পড়ুয়া একাকী ছেলেটির গলা ছেড়ে করুণ কান্না গলির বাতাসকে করে তুলেছিল শোকাকুল।

বাংলাদেশে কত গলি আছে? জানা ছিলনা।। অজ্ঞতা কখনো সখনো আশির্বাদ। মনে করতাম অন্য গলিতে মৃত্যু আসেনি, কোন বাবা নিখোঁজ হয়ে যান নি।

এ ছিল মার্চ-এপ্রিলের ঘটনা। আসলো বহু কাঙ্খিত ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয়। আনন্দ আর উল্লাস চারদিকে। মুক্তিযোদ্ধারা শহরে ঢুকছেন। সবাই ছুট্ছে রেসকোর্সের মাঠে যা এখন সোহরাওয়ার্দি উদ্যান। চারদিকে টুকটাক গুলির শব্দ। আমাদের ছোট্ট গলি যে রাস্তাতে মিশেছে ঠিক তার উল্টো দিকের বাড়ী কেয়া ভিলা। সে বাড়ীর কেয়ার বাবা বিজয় মিছিলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ছুটে আসা গুলিতে ঐদিন উনি মারা যান।

ঐদিন সন্ধ্যায় কেউ একজনের আনা খবর শুনে আম্মা হাহাকার করে উঠলেন ‘আহারে আলিম মামু নাই’। শুনলাম মায়ের কি রকম যেন মামা হন সেই “আলিম মামু”কে রাজাকার না কি আল বদররা ধরে নিয়ে গেছে। পরে জেনেছি অনেক বুদ্ধিজীবীর একজন চক্ষু চিকিৎসক আলিম চৌধুরীকেও আল বদররা ধরে নিয়ে যায়।

এমন ঘটনা সবার গলিতেই ঘটেছে। শীতলক্ষ্যা নদীতে আমাদের গলির পলায়নপর মায়ের ছেলে টুকু বা কুটুই শুধু হারিয়ে যায়নি। হারিয়ে গেছে শিল্পী বারীন মজুমদারের ছোট্ট মেয়ে মধুমতি। বাপ্পা মজুমদারের দিদি মধুমতি মজুমদার।

শুধু আমাদের গলি নয় আমাদের সারাদেশে কারবালার ক্রন্দন আকাশের চোখে আসু এনেছিল।